সোনালি কিরণ

বলেশ্বরের বুকে এখন শান্ত বাতাস। হালকা কুয়াশা যেন চাদর বিছিয়ে দিয়েছে জলে। বাতাসের টানে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে কুয়াশার চাদর, উত্তর থেকে দক্ষিণে। চারদিকে সুনসান নীরবতা। হঠাৎ হঠাৎ মাল্লার দাঁড়ের ক্যাচ ক্যাচ আওয়াজ ভাঙছে নীরবতা। নদীর বুকে ভেসে যাচ্ছে নৌকার সারি। কখনো আবার শোনা যাচ্ছে গলুইয়ে বসা কিশোরের বৈঠার টানে ছলাত ছলাত শব্দ। হাল ধরে বসে আছে বৃদ্ধ রহমত মাঝি। ষাটের ঘর-ছুঁই ছুঁই তার বয়স। বইটা হাতে গলুইতে বসা তার কিশোর সন্তান শাওন।

শাওন পিছন ফিরে বললো—বাজান, আমি তো তোমারেও দেহি না, সামনেও কিছু নাই—যাইতাছি কই?

খুক খুক করে একটু কাশলো রহমত মিয়া। গলায় জড়ানো একটা পুরনো মাফলার, মাথায় চাদর। বললো, বাজান চিন্তার কোন কারণ নাই। আইজ তিরিশ বছর এই নদীতে নৌকা বাই, ভুল অইবে না।

খানবাড়ির বউ নৌকার ভিতর থেকে উঁকি দিয়ে বললো—রহমত মিয়া, আর কতো দূর?

ভাবিজান, আর বেশি দূর না, দশ পনেরো মিনিট লাগবে মনে অয়। বইঠা বাইতে বাইতে জবাব দিলো রহমত।

খান বাড়ির বড় গিন্নি বিলকিস বেগম বললেন—ঠিক জেটির সাথে ভিরাইবা। ওখানেই নামবো।

ঠিক আছে ভাবিজান—আপনে পান খাইতে খাইতেই আমি ভিরাইয়া ফালামু।

বিলকিস বেগম পান খাওয়া ছেড়েছেন বহুদিন। তবে বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে অবশ্য দু'এক খিলি পান খেতেন স্বামী শাহেদের পীড়াপীড়িতে।

খান বাড়ির একমাত্র ছেলের বউ বিলকিস বেগম। শ্বশুরের ভিটা ছেড়ে, অনেক দূরে চলে গিয়েছিলেন আজ থেকে সাতাশ বছর আগে। তখনও ছিলো এমন শীতকাল। কিন্তু কুয়াশা এতো গভীর ছিলো না। একাত্তরের নভেম্বর, তার শেষ দিকের কথা। বিলকিস বেগম কেমন আনমনা হয়ে গেলেন। স্মৃতি তাঁকে এখনও তাড়া করে ফিরছে। তখনও ওঁদের বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি যায় নি। পিলার পোঁতা হয়েছে মাত্র। তত্ত্বাবধান করছে বিহারি ইঞ্জিনিয়ার। সে-ই এখানকার ইনচার্জ, সাব-ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের মেজাজ মর্জি কেমন বদলে গেছে। সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে বললো—খান সাব, কাল শিকার করলাম।

চোখে প্রশ্ন মেলে শাহেদ জিজ্ঞেস করলো—কী শিকার করলেন? এদিকে ঘুঘু আর বক ছাড়া তো কিছুই পাওয়া যায় না।

ইঞ্জিনিয়ার চোখ সরু করে সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললো—হ্যাঁ ঘুঘুই শিকার করেছি।

শাহেদ তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বললো— মস্করা করছেন !

হঠাৎ রেগে গেল ইঞ্জিনিয়ার জানজুয়া। টেবিল চাপড়ে চিৎকার করে বললো — ক্যায়সা মস্করা! হামতো মুসলিম হ্যায়। হামতো হিন্দু বাঙালকো গুলিছে মারডালা। ইয়ে শিকার হ্যায় কি নেহি।

তারপর শান্ত হয়ে বসে শাহেদের দিকে তাকিয়ে বললো—তোমভি কসুর ওয়ালা হো! সব বাঙাল আদমি নাদান। You are all bloody Hindus, non-muslims. তার চোখে ঘৃণা ফুটতে দেখলো শাহেদ।

শাহেদের মনে প্রতিবাদের ঝড়। দ্বিধা কাটিয়ে বলে ফেললো— You are wrong, we are good muslims.

ইঞ্জিনিয়ার ওর দিকে তাকিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বললো—তোমকো আভিতক যেয়াদা লেসন নেহি মিলা। আভি তোম যাও। বাদমে দেখলেঙ্গে।

শাহেদ কোন কথা বললো না। গট গট করে বের হয়ে এলো তার অফিস থেকে। আর ক'টা দিন। চারদিকে পাক হানাদারদের মরণকান্না শুরু হয়েছে। দুর্দান্ত মুক্তিবাহিনীর মারে তাদের মুখের পানি চোখের পানি একাকার। যে পতন শুরু হয়েছে তা আর কেউ ঠেকাতে পারবে না। ইসলামের নাম নিয়ে বেহায়ার মতো ধর্মের অপমান করে চলছে ওরা—আল্লাহ সইবে না, সইতে পারে না।

শাহেদ বাড়ি ফিরলো বিমর্ষ মুখে। জানালো সব বিলকিসকে। তারেকের বয়স তখন মাত্র সাত দিন। ওর ভূমিষ্ঠ হবার সময় বেশ ধকল গেছে বলে তখনও বিলকিস সোজা হয়ে হাঁটতে পারেন না।

বিলকিস বললেন—চলো, বাড়ি ছেড়ে কোথাও কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকি।

শাহেদ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো স্ত্রী'র দিকে। বললো— দুঃখিত বিলকিস। তোমার কথা মানতে পারলাম না। এ আমার দেশ, আমার মাটি। একবার পালানো শুরু করলে এর শেষ নেই। আমি কোন অন্যায় করিনি। আমি কোথাও যাবো না।

বিলকিস নরম সুরে বললেন— ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্ন নয়। তুমি যাদের পাল্লায় পড়েছ, ওরা কেউ মানুষ নয়, সব হায়েনা। শকুনের দৃষ্টি মেলে বসে থাকে কখন কার কি সর্বনাশ করবে। কিন্তু শাহেদ সিদ্ধান্তে অটল।

তারেকের দিকে তাকালেন বিলকিস। এখনও শুয়ে আছে। ব্যারিস্টার হয়েছে দু'বছর আগে।

বিদেশ থেকে ফিরে এসেছে মাত্র মাস তিনেক। ওর ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। বাবার মতোই জেদি, সৎ এবং একরোখা হয়েছে ছেলেটা।

আবার বিলকিস বেগম ফিরে গেলেন ফেলে আসা স্মৃতির গভীরে। মধ্যরাত পার হয়েছে। হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। কাঁচা ঘুম থেকে উঠেছে শাহেদ। হ্যারিকেনের আলো উস্‌কে দিয়ে ঘড়ি দেখলো। রাত তিনটা। হাই তুলতে তুলতে ভাবলো—এতো রাত, কে হতে পারে !

নৌকার ভিতর শালটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নড়ে চড়ে বসলেন বিলকিস। নৌকার গায়ে আছড়ে পড়া পানির কুল কুল ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। শাওন অনেকক্ষণ ওর বাবার সাথে আর কথা না বলে একটানা বইঠা বাইছে। একটু হালকা হতে শুরু করেছে কুয়াশা। সূর্য এখনি ঘুম ভেঙে নতুন ভোরকে আলিঙ্গন করবে। বিলকিস বেগম পর্দার ফাঁক দিয়ে কুয়াশার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আবার হারিয়ে গেলেন অতীতে।

শাহেদ জিজ্ঞেস করলো—কে ?

উত্তর এলো বাহিরে থেকে — খান সাব, আমি কলিম।

শাহেদের বুকে ছড়িয়ে পড়লো একটা অচেনা আতঙ্ক। এই কলিম এখানকার আল বদরের কমান্ডার। হেন অপকর্ম নেই যে সে করে বেড়চ্ছে না।

এতো রাতে কী দরকার কলিম? জিজ্ঞেস করে শাহেদ।

খান সাব, আপনারে ক্যাম্পে নেয়ার জন্য ক্যাপ্টেন সাব সালাম দিছে।

এতো রাতে আমি যাবো না, কাল ভোরে দেখা করবো।

না গেলে অইবনা খান সাব। ক্যাপ্টেন সাবরে গরম দেইক্যা আহছি। কলিমের গলায় তখনও সমীহ ভাব।

বিলকিস শাহেদকে না যাবার জন্য চোখে চোখে ইশারা করলেন। চোখে ওর ভয় আর মিনতি ফুটে উঠেছে।

দেরি দেখে এবার জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা দিলো কলিম। বললো— খান সাব, ভালয় ভালয় চলেন, যতো দেরি করবেন ততই বিপদ অইব। আমি কিন্তু একলা না।

শাহেদ শার্টটা গায় চাপালো, প্যান্ট পরলো ধীরে সুস্থে। রাজার হাটের এপার থেকে মিলিটারি ক্যাম্প মাইল খানেক। কলিমের সাথে কথা না বাড়িয়ে পথে পা বাড়ালো শাহেদ। বিলকিসের মনে হলো একরাশ অন্ধকার হঠাৎ করেই শাহেদকে গ্রাস করে ফেললো। দুর্বল বিলকিস কিন্তু সারারাত চোখ এক করতে পারলেন না। ভোরবেলা উঠেই প্রথমে ছুটলেন পিস্ কমিটির চেয়ারম্যানের কাছে। সে বললো—ক্যাপ্টেন সাহেব ন'টার আগে ঘুম থেকে ওঠে না, উঠলে কথা বলে দেখি কি করা যায়।

বসে থাকলেন বিলকিস চেয়ারম্যান সাহেবের বারান্দায়। ন'টায় নয়, বারোটার দিকে ক্যাপ্টেনকে পাওয়া গেলো। রাতে নাকি খানিকটা মালপানি খেয়ে ঘুমিয়েছিলো, তাই উঠতে দেরি হয়েছে। সে জানিয়ে দিলো এ ব্যাপারে রাতের আগে তার কথা বলার সময় হবে না। বিলকিসকে যেন রাতে পাঠিয়ে দেয়া হয় ক্যাম্পে।

ক্যাম্পে যাবার আগে আট দিনের বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিলেন বিলকিস। বিপদ কাটানোর জন্য তাঁর বৃদ্ধ শ্বশুর মিলাদ পড়াচ্ছেন। সব আতঙ্ক পিছনে ফেলে শাহেদের জন্য শহরের মাঝখানে বিরাট সরকারি স্কুলের সামনে গিয়ে হাজির হলেন তিনি। ক্যাপ্টেন সাব আসতে বলায় তাঁকে ছাড়লো স্যান্ট্রি। ওয়েটিং রুমে বসে বসে ডাক পড়ার অপেক্ষায় অধীর হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন সদ্যপ্রসূতি বিলকিস বেগম।

কিছুক্ষণ পরে দু'তিনটা রুমের পরের একটা রুমে কারো উচ্চ হাসি ও সাথে সাথে একটা মেয়ের কাতর অনুনয় শোনা গেলো। কেঁপে উঠলেন বিলকিস। ধীরে ধীরে একটা অজানা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়তে লাগলো তার সারা শরীরে। মেয়েটা বার বার বলছে। আপনি আমার বাবা, আর পারি না। আমারে মাইর‍্যা ফ্যালান। আবার উচ্চ হাসি—নেহি, হাম তোমকো সাথ পেয়ার করে গা। তোমকো হাম ক্যায়সে মারেগা, কিসকো সাথ পেয়ার করেগা হাম?

কিছুক্ষণ পর মেয়েটার শুধু কাঁপা কাঁপা আর্তনাদ শোনা গেলো—বাবাগো, মাগো, ও আল্লাহ, তুমি বাঁচাও! সময় বেশি লাগলো না। দেখতে দেখতে মেয়েটার আর্তনাদ অন্য কারো উন্মত্ত গোঙানির মাঝে হারিয়ে গেলো। পাথর হয়ে বসে থাকলেন বিলকিস। সব কেমন যেন ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে লাগছে।

বিশাল বপু একজন লোক যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালো বিলকিসের সামনে। খাকি পোশাকের উপর নাম লেখা সেলিম। নাম আর র‍্যাঙ্ক দেখে বিলকিস বুঝে নিলেন এই লোকই সুবেদার সেলিম। যে পাষণ্ড একের পর এক নিরস্ত্র নিরীহ মানুষকে হত্যা করে চলেছে। দেশের আইন এখন এরাই।

এই ছোট্ট শহরটার নদী পারাপারের ঘাট, যাকে সবাই জেটি বলে জানে, বধ্যভূমি করে ফেলেছে ওরা। ইতিমধ্যেই নাকি হাজার ছয়েক লোককে হত্যা করা হয়েছে সেখানে। চোখ বেঁধে গুলি করে উল্লসিত হয় হায়েনারা।

সুবেদার সেলিম বিলকিসের সামনে দাঁড়িয়ে গোফে তা দিলো। তারপর বললো — এই লাড়কি, কিসকো পাস আয়া তোম ?

বিলকিস ছোট্ট তারেককে বুকে শক্ত করে ধরে বললো—কাপ্তান সাহাবকো পাস।

হায়েনার কদাকার মুখে ছড়িয়ে পড়লো বিকৃত হাসি। বললো—ঠিক হ্যায়, ঠিক হ্যায়। তারপর গোফে তা দিতে দিতে চলে গেলো সেলিম নামের আতঙ্ক।

ঘণ্টাখানেক পরে ডাক পড়লো বিলকিসের। অল্প বয়সী ক্যাপ্টেন এজাজ, কেমন ঘোর-লাগা চোখে তাকালো বিলকিসের দিকে।

তোমকো গোদমে কোন হ্যায়? প্রশ্ন করে হাতের লাঠি বার কয়েক ঠুকলো মেঝেতে।

মেরে লাড়কা, তারেক। ভয়ে ভয়ে জবাব দিলো বিলকিস।

মাথা নাড়লো ক্যাপ্টেন এজাজ। বললো—বহুত খুব, Good name. Any way, তোম কেয়া মাঙতা।

আমার স্বামী শাহেদ খানকে আপনার এখানে কাল রাতে নিয়ে এসেছে আল বদরের কমান্ডার কলিম।

হাঁক ছাড়লো ক্যাপ্টেন—কলিম, ইধার আও।

হাত কচলাতে কচলাতে কলিম এসে দাঁড়ালো তার সামনে।

ক্যাপ্টেন লাল চোখ মেলে তাকালো কলিমের দিকে। জিজ্ঞেস করলো- This young lady. কেয়া বোলা?

কলিম তেমনি হাত কচলাতে কচলাতে বললো—স্যার, ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের কেসটা, সেই শাহেদ সাব।

ক্যাপ্টেন এবার ফিরলো বিলকিসের দিকে, বললো—Your husband is a miscreant. He will be executed tomorrow. But now you can see him.

যখন শাহেদের কাছে ওঁকে নিয়ে আসা হলো তখন বিলকিস ওকে চিনতে প্রথমে পারলেন না। মুখ থেতলে গেছে, সামনের চারটে দাঁত উধাও। সারা শরীরে কালসিটে দাগ, বাম হাতের তিনটা আঙুল ভাঙা।

নৌকার ছইয়ের মধ্যে বিলকিসের মন ব্যথায় গুমরে উঠলো। দু'চোখে নিঃশব্দ বইতে শুরু করেছে বাঁধভাঙা অশ্রু। শাহেদ যেন ওর সাথে সেই শেষ কথাগুলো বলছে।

ওকে মানুষ করো, হাল ছেড়ে দিও না। আমরা ভীরু নই, বীরের জাতি। এ কথা ওদের বুঝিয়ে দিয়েছি। যদি বাঁচি, বাঘের মতো বাঁচব। মরলেও বাঘের মতোই।

বাচ্চাকে নিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন বিলকিস। নিজেকে আবিষ্কার করলেন হাসপাতালের শক্ত বিছানায়!

হুঁশ ফিরতেই ধড়মড় করে উঠে বসলেন। বললেন—আজ কী বার? ক'টা বাজে?

তখন প্রায় দুপুর। বৃদ্ধ শ্বশুর লাঠি ভর দিয়ে বসে আছেন। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন — মা, বাসায় চলো।

বিলকিস সরাসরি প্রশ্ন করেন—শাহেদ কই?

বৃদ্ধ এ কথার জবাব দিতে পারেন নি। চোখে কম দেখেন। তার ওপর অবিরল অশ্রু বর্ষণ। কোন রকম নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন—ও শহীদ হয়েছে। তবে লাশ খুঁজে পাই নি। মনে হয় সবার মতো শাহেদের লাশও পানিতে ভেসে গেছে বহুদূর। বলতে বলতে বাকরুদ্ধ হলেন বৃদ্ধ। খানিকটা কেশে গলা পরিষ্কার করে ফের বললেন— তবে তুমি শুনে খুশি হবে, তোমার স্বামীকে গুলি করার আগে চোখ বাঁধতে গিয়েছে, ও বাঁধেনি। বলেছে, সে কাপুরুষ নয়, এই জাতিরই একজন। যখন ওকে জেটিতে দাঁড় করিয়ে পিছন থেকে গুলি করার চেষ্টা করলো হানাদারেরা, তখন তোমার স্বামী ঘুরে দাঁড়িয়ে বুক উঁচিয়ে দিয়েছে। কি বলেছে শুনবে? বলেছে, এক শাহেদ যাবে, হাজারো শাহেদের জন্ম হবে। পিঠে গুলি খেতে এ জাতির জন্ম হয়নি। বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়লেন বৃদ্ধ। বললেন— মা, এমন ছেলের পিতা হবার জন্য আমি গর্বিত। তোমার স্বামীর গর্বে তুমি গরবিনী নও!

বিলকিস কোন জবাব দিলেন না, শুধু পাথর হয়ে বসে থাকলেন। লক্ষ্য করলেন, কথা বলতে বলতে বৃদ্ধের দু'চোখে জ্বলে উঠলো আগুন এবং হঠাৎই হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে তিনিও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

নিজের হাতে শ্বশুরের শেষকৃত্য সম্পাদন করেছেন বিলকিস। তরপর শাহেদের বংশধর শিশু তারেককে বুকে ধরে ছেড়ে গেছেন এ ছোট্ট শহর সাতাশ বছর আগে। বড্ড দীর্ঘ সময়! তবুও মনে হয় যেন এই তো সেদিন! হঠাৎ বিলকিসের বুক থেকে একটা বড় দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এলো।

তারেক উঠে বসেছে। এই তারেক সেই সাতাশ বছর আগের শাহেদ যেন। বাপ ছেলেতে এতো মিল, মুগ্ধ হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলেন বিলকিস।

বাইরে রহমত মিয়া বললো—ভাবিজান, আইস্যা গেছি। একটু ছাওয়া ছাওয়া দেহা যায়। কুয়াশা তো, হেই জন্য পরিষ্কার না।

বিলকিস এবার নৌকার পর্দা খুলে ফেললেন। বললেন—রহমত মিয়া, আমার চেনা জায়গার সাথে এ জায়গার মিল নেই কেন?

পাইবেন কেমনে ভাবিজান? এ জায়গা এখন আর আগের মতো ব্যস্ত না। ব্রিজ অইতে আছে, ফেরিঘাট দূরে সরাইয়া নিছে। হেই জন্যই আগের মতো জমজমাট না। লোকজন এদিকে খুব একটা আয় না। দুপুর বেলা কিছু পোলাপাইন এখানে ডুব সাঁতার কাটতে আয়।

ধীরে ধীরে জেটির গায়ে নৌকা ভিড়লো। রহমত মিয়া বললো—এখন উঠতে পারেন ভাবিজান। পোলাডা তো মাশআল্লাহ ওর বাপের মতো অইছে। ঠিক যেন খান সাব।

বিলকিস রহমত মিয়ার কথার কোন জবাব দিলেন না। নৌকার কিনারে পা রেখে উঠে এলেন জেটিতে। তারেক এলো মা'র পিছু পিছু।

এক দৃষ্টিতে জেটির কিনারে দাঁড়িয়ে জেটি দেখছেন বিলকিস। নিরিবিলি জেটি। অর্ধেক ডুবে আছে পানিতে। এখনো কুয়াশায় ঢাকা বলেশ্বর। ওর শরীরটা কাঁপছে তিরতির করে। আস্তে আস্তে বললেন—শাহেদ, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ? আমরা তোমার কাছে ফিরে এসেছি। আবার ডাকলেন আস্তে আস্তে—শাহেদ, তোমার ছেলে এসেছে তোমাকে দেখতে, বহুদিন তোমার সাহস আর বীরত্বের কথা ওকে বলেছি। ও এখন বড় হয়েছে, অনেক বড়। তুমি এখন ওকে নিয়ে গর্ব করতে পার।

মা'র গা ঘেঁষে দাঁড়লো তারেক।

বিলকিস ফিসফিস করে বলে চলেছেন—শাহেদ তুমি আমার অহংকার, তুমি এদেশের অহংকার। তুমি আমাদের গর্ব।

বিলকিসের দু'চোখে আশ্রুধারা। সব যেন কেমন ঝাপসা হয়ে এলো। শরীর যেন পালকের মতো হালকা, পড়ে যাচ্ছেন বিলকিস।

তারেক মাকে আদর করে জড়িয়ে ধরলো বুকে। জড়িয়ে ধরল যেভাবে তার শাবককে আগলে রাখে হরিণ। বললো—তোমার মতো মা আছে বলেই আমার মতো সন্তানেরা বেড়ে উঠেছে। আগাছা হয়ে সময়ের ভিড়ে হারিয়ে যায়নি। তোমার মতো কতো শত সহস্র মাকে বুকে ধরেছেন এই গরবিনী দেশ! আর দেখ, কি শান্ত বইছে নদী। শোন দূরে শিশুর কোলাহল। এগুলো সব তোমাদের দান।

নৌকায় দাঁড়িয়ে রহমত মিয়া চোখ মুছলো। শাওন বললো—বাজান কি অইছে? রহমত মিয়া বললো—বুঝবানা বাজান, তোমার তখন জন্ম অয় নাই। যুদ্ধ দেহ নাই। কাজেই বুকের পোষা দুঃখ তুমি বুঝবা না।

সাতাশ বছর পর ফিরেছেন বিলকিস। একাকী যাত্রার বড্ড দীর্ঘ সময় তিনি পেরিয়ে এসেছেন, শক্তি যুগিয়েছে তাঁকে কিছু স্মৃতিময় ক্ষণ। দাঁড়িয়ে আছেন সেই জেটিতে যা ছিলো নির্দয় হায়েনাদের স্বঘোষিত বধ্যভূমি। এখানেই তিনি হারিয়েছেন তাঁর প্রিয়জনকে। কুয়াশা কেটে গেলো হঠাৎই। সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। ভোরের প্রথম রোদে ঝিকমিক করছে বৃক্ষশাখা, বনবাদাড় আর সবুজ প্রান্তর। সূর্যের একরাশ সোনালি কিরণে ঝলমলে করে উঠলো বলেশ্বরের বয়ে যাওয়া শান্ত স্রোত। মনে হয় বিলকিসের দুঃখ ভুলাতে আজকের ভোর মিষ্টি পরশ বোলাতে শুরু করেছে।